রণাঙ্গন ৭১

রণাঙ্গন ৭১ # ২ রণাঙ্গন ৭১ # ৩ রণাঙ্গন ৭১ # ৪
রণাঙ্গন ৭১ # ৫ রণাঙ্গন ৭১ # ৬ রণাঙ্গন ৭১ # ৭
রণাঙ্গন ৭১ # ৮ রণাঙ্গন ৭১ # ৯ রণাঙ্গন ৭১ # ১০
রণাঙ্গন ৭১ # ১১ রণাঙ্গন ৭১ # ১২ রণাঙ্গন ৭১ # ১৩
রণাঙ্গন ৭১ # ১৪ রণাঙ্গন ৭১ # ১৫ রণাঙ্গন ৭১ # ১৬
রণাঙ্গন ৭১ # ১৭ রণাঙ্গন ৭১ # ১৮ রণাঙ্গন ৭১ # ১৯

রণাঙ্গন ৭১

সম্পাদনা

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

রণাঙ্গন ৭১	মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/4 বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	অমৃতা শারলীন রাজ্জাক
প্রচ্ছদ	আইউব আল আমিন
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৪৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Amrita Sharlin Razzak
Ronangon 71	
(Libaration Warfield of 1971 By)	Manik Mohammad Razzak
Cover Design	Ayub Al Amin
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	450.00 Tk only
ISBN	978-984-97773-3-5
E-mail	nalonda71@gmail.com

উৎসর্গ

শাহ আলম, একহারা গড়নের সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক। ট্রেনে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাড়ি তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমায়। হানাদার সেনারা গণহত্যা শুরু করলে; দেশকে শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে হকারি করতে করতে চলে আসেন রংপুরে। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়ে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে; নির্ভীক চিত্তে লড়াই করেন বিভিন্ন রণাঙ্গনে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে উত্তরবঙ্গের ডোমার উপজেলার আমবাড়ি হাটে এক অপারেশনে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে যান এই দুঃসাহসিক বীরযোদ্ধা। শাহ আলমের মতো এমন হারিয়ে যাওয়া দেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

প্রাক্কথন জাতিগত পরিচিতি নিয়ে দু-মুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা একদিন যে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন, সেই পাকিস্তানই শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের সমস্ত স্বপ্ন নাশ করে দিয়েছিল। সেই পিতৃপ্রজন্ম পরিণত বয়সে আবার সোচ্চার হয়েছিল চলমান শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। একটি নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর নানারৈখিক অনাচারের বিরুদ্ধে। একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন, মানবতাবাদী ও ন্যায়সংগত জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে হয়েছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঙালি জাতির সেই স্বপ্নকে শত বছরের জন্য দাবিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অনেক প্রহসনের পর বেছে নিয়েছিল বল প্রয়োগের পথ। নিরস্ত্র জাতির ওপর রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদিম কায়দায় মেতে উঠেছিল হত্যাযজ্ঞসহ নানামাত্রিক ধ্বংসযজ্ঞে। অতঃপর বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে তাঁরা হাতে তুলেছিল হাতিয়ার। দিকে দিকে গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ। একটি তথাকথিত প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সমুখে বাঙালি দামাল সন্তানেরা সাধারণ মানের অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্ভীক চিত্তে। শুধুমাত্র দেশপ্রেমের বলে বলিয়ান হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা সেসময় যেভাবে সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে রণাঙ্গনে লড়েছিল, তা দেখে হতবাক হয়েছিল বিশ্বের সমরবিশারদগণ। অতঃপর দখলদান হানাদার সেনারা বাধ্য হয়েছিল আত্মসমর্পন করতে। এরইসাথে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশলক্ষ বাঙালিকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল, দুইলক্ষ নারীকে খোয়াতে হয়েছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ৯৮ লক্ষ বাঙালিকে হতে হয়েছিল ভিটাচ্যুত, লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে সহায় সম্পদ হারিয়ে নিপতিত হতে হয়েছিল নিঃস্বতার গহ্বরে।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালে নারী, পুরুষ ও পেশা নির্বিশেষে অকুতোভয় মুক্তিসেনারা কতটা নেতিবাচক অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন বাজি রেখে এ দেশটির জন্য যুদ্ধ করেছিলেন; যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি, সেই প্রজন্মের সন্তানরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। দিনের পর দিন অভুক্ত থেকে, রাতের পর রাত নিদ্রা ভুলে, ঝড়-বৃষ্টি-শীত উপেক্ষা করে, মৃত্যুর পরোয়া না করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান-দেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধারা এ দেশকে দখলদার মুক্ত করার লক্ষ্যে নির্ভীক চিত্তে লড়াই করেছেন। যুদ্ধ দিনের সেসব কথা জানান দেয়ার জন্যই এ গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস। এখানে মোট ১৬ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার রণাঙ্গনের নানামাত্রিক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে বোনের কলমে তুলে ধরা হয়েছে একজন শহিদ কমান্ডারের বীরত্বগাথা। প্রতিটি লেখার সাথেই সংশ্লিষ্ট বীরযোদ্ধার সার্বিক পরিচিতি সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হয়েছে। বর্ণক্রম অনুযায়ী লেখাগুলো বিন্যাসিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে ‘রণাঙ্গন-৭১’ শিরোনামে বীরযোদ্ধা মো. আব্দুস সামাদের লেখাটি তুলে ধরা হয়েছে তাঁরই দেওয়া বক্তব্যের আলোকে। লালমনিরহাট শহরের পশ্চিম প্রান্তস্থ যুগীটারী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মো. আব্দুস সামাদ ১৯৭১ সালে লালমনিরহাট কলেজের ১ম বর্ষে পড়তেন। শহরে হানাদার-বাহিনীর অনুপ্রবেশের পর পরিবারসহ বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। অতঃপর যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মূর্তি ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মর্টারম্যান হিসেবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি নানামাত্রিক গেরিলা অপারেশন করেছেন। তাঁর যুদ্ধজীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অপারেশন ছিল কেটকিবাড়ি অপারেশন। ‘একাত্তরের রণাঙ্গন’ শিরোনামে যুদ্ধ দিনের কথা লিখেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. আবু হোরায়রাহ। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী। থাকতেন রংপুরের মাহিগঞ্জে। বাবা ছিলেন তৎকালীন ইপিআরের (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স) নন কমিশন্ড কর্মকর্তা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হলে; তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এর অনতিকাল পরেই আবু হোরায়রাহ ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তাঞ্চলের বাঙালি সেনাদের অধীনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ছয় নম্বর সেক্টরাধীন সাহেবগঞ্জ ও বাউড়া সাব সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে হানাদার-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ‘রণাঙ্গনের কথা’ শিরোনামযুক্ত লিখাটি লিখেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম আব্দুল জব্বার প্রধান। মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালেই তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মূর্তি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে নিজ এলাকা তথা ছয় নম্বর সেক্টরাধীন বাউরা সাব সেক্টরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। এ লেখাটি ২০০৬ সালে পাটগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ‘মুক্তাঞ্চল পাটগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা শীর্ষক স্মারক গ্রন্থ-প্রাক্কথন’ এ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের অনুমতিক্রমে সম্পাদনা করে এখানে পুন:গ্রন্থিত।

‘একাত্তরের যুদ্ধজীবন’ শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লেখা হয়েছে ফরিদপুর জেলাস্থ আলফাডাঙ্গা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা এস কে কলমদার আলমের দেওয়া বক্তব্যের আলোকে। ভারতের বিহার প্রদেশের চাকুলিয়া ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তিনি নিজ এলাকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে হানাদার ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালিয়েছেন। ‘যুদ্ধকালের স্মৃতিকথা’ শিরোনামযুক্ত লেখাটি ফরিদপুর সদরের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলহাজ্ব গুলজার আহম্মেদ খান-দুলালের বক্তব্যের আলোকে লিখা হয়েছে। ভারতের বিহার প্রদেশের চাকুলিয়া ট্রেনিং সেন্টারে উচ্চ পর্যায়ের (সিএনসি) সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তিনি কমান্ডার হিসেবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন। তাঁর এ লেখাটি ২০১৫ সালে

বদিউজ্জামান চৌধুরী সম্পাদিত ফরিদপুর: ইতিহাস ঐতিহ্য-১৩: মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ পর্যায়ে তাঁর সাক্ষাৎকারের নিরিখে সম্পাদনা সাপেক্ষে পুনর্লিখিত লেখাটি এ গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়েছে। 'রক্ত ঝরিয়েছি একাত্তরে' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লিখেছেন বীরযোদ্ধা জসীম উদ্দিন। ১৯৭১ সালে তিনি চাঁদপুর কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষে পড়তেন। ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে নিজ জেলা চাঁদপুরের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। রণাঙ্গনে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে প্রচুর রক্ত ঝরিয়েও তিনি প্রাণে রক্ষা পান। 'সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতিকথা' শিরোনামে সরাসরি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন আহমেদ। চাকরি করেছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। মুক্তিযুদ্ধকালে অবস্থান করছিলেন পাকিস্তানে। অতঃপর সেখান থেকে দেশে এসে বীরত্বের সাথে একটি সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

'প্রতিরোধের প্রহর' শিরোনামযুক্ত লেখাটি লেখা হয়েছে মো. জহুর শেখের সাক্ষাৎকারের আলোকে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। পোস্টিং ছিল দিনাজপুরে। হানাদার-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধকালে মারাত্মকভাবে আহত হন এই বীরযোদ্ধা। 'রণাঙ্গনের দিনগুলো' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লিখেছেন সিরাজগঞ্জ জেলাস্থ শাহজাদপুর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পড়তেন ৮ম শ্রেণিতে। সেই তরুণ বয়সে ভারতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিং জেলাস্থ শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা আর্মি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন। 'সাব সেক্টর কমান্ডার' ক্যাপ্টেন বাবুল তথা বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর মোহাম্মদ বাবুল, ক্যাপ্টেন বাবুল নামেই সমধিক পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ৯ নম্বর সেক্টরাধীন ২ নম্বর সাব সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। এছাড়া এই বীরযোদ্ধা ছিলেন ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার ৫ নম্বর আসামী। ক্যাপ্টেন বাবুল বর্তমানে ফরিদপুর শহরে বসবাস করছেন। সাক্ষাৎকারে দেওয়া বক্তব্যের নিরিখে তাঁর আগরতলা মামলা ও যুদ্ধজীবনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

'চরঘোনার রণাঙ্গন' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লিখেছেন মানিকগঞ্জ জেলার বীরযোদ্ধা বজলুল হক বিশ্বাস। সে সময় তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। ভারতের আসাম রাজ্যের হাফলং পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে নিজ এলাকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন। এখানে শুধু দেশে প্রবেশকালে হোমনা থানাধীন চরঘোনা গ্রামে ট্রানজিটকালে সংঘটিত যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 'স্বাধীনতার যুদ্ধকাল' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ বাচ্চু মাতুব্বরের সাক্ষাৎকারের আলোকে লিখা হয়েছে। ফরিদপুর জেলাস্থ সালথা উপজেলার বীরযোদ্ধা বাচ্চু ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর নিজ এলাকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন। 'যুদ্ধদিনের স্মৃতিকথা' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লিখেছেন বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলাস্থ রামগঞ্জ উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মহসীন ভূঁইয়া। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি রামগঞ্জ কলেজে পড়তেন। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেলাঘর ট্রেনিংক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর দেশে ফিরে নিজ এলাকার কয়েকটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন।

'দেশের জন্য যুদ্ধ' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লেখা হয়েছে ফরিদপুর জেলাস্থ নগরকান্দা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা রাধেশ্যাম মণ্ডলের সাক্ষাৎকারের আলোকে। ভারতের বিহার রাজ্যের চাকুলিয়া ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তিনি নির্ভীক চিত্তে লড়াই করেছেন নিজ জেলার বিভিন্ন রণাঙ্গনে। 'আমিও ছিলাম রণাঙ্গনে' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লেখা হয়েছে ফরিদপুর জেলাস্থ মধুখালী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজুল ইসলাম সিকদারের সাক্ষাৎকারের নিরিখে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি স্থানীয় পর্যায়ে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে-স্থানীয়ভাবে গঠিত বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে যুদ্ধ করেছেন। চালিয়েছেন রাজাকার বিরোধী নানামাত্রিক অপারেশন। 'একাত্তরের যোদ্ধাজীবন' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লেখা হয়েছে বর্তমান সিরাজগঞ্জ উপজেলাস্থ শাহজাদপুর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত সমরেন্দ্র নাথ সান্যালের লিখিত ভাষ্যের আলোকে। তিনি স্থানীয়ভাবে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়ে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। অবতীর্ণ হন সম্মুখ সমরে। প্রকাশ থাকে যে ২০১৩ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি যুদ্ধজীবন সম্পর্কে যা লিখে রেখেছিলেন, তারই আলোকে এ লেখাটি লেখা হয়েছে। 'কমান্ডার শহিদ সালাহউদ্দিন' শিরোনাম সম্বলিত লেখাটি লিখেছেন শহিদ কমান্ডার কাজী সালাহউদ্দিনের বড় বোন হোসনে আরা বেগম দুলারী। ফরিদপুরের ইয়াছিন কলেজের ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বীরযোদ্ধা কাজী সালাহউদ্দিন নাসিম প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতে যাননি। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ফরিদপুরে নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলেন একটি স্বতন্ত্র বাহিনী। এরপর স্থানীয়ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে এলাকার বিভিন্ন রণাঙ্গনে নির্ভীক চিত্তে রাজাকার ও হানাদার-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বিজয়ের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে এই বীরযোদ্ধা হানাদার-বাহিনীর সাথে এক সম্মুখ সমরে শাহাদত বরণ করেন।

প্রকাশ থাকে যে বয়সজনিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকা দিনকে দিন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। আমরা যারা বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী প্রজন্ম; তাদের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই এ সংখ্যা একদিন শূন্যতার স্তরে পতিত হবে। থেকে যাবে এই দেশ, ইতিহাসের পাতায় আশ্রিত হবে মহান

স্বাধীনতা যুদ্ধের সৌর্য-বীর্যের নানামাত্রিক গৌরবের আখ্যান। এহেন বাস্তবতায় আমাদের প্রজন্মের সকলেরই মুক্তিযুদ্ধের নানারৈখিক ইতিহাস সংরক্ষণে এগিয়ে আসা কর্তব্য বলে মনে করি। সেই কর্তব্যের তাগিদ থেকেই এ গ্রন্থ প্রকাশে হাত দিয়েছি। ইতোমধ্যে নানা কারণে রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের তুলনায় অরণাঙ্গনীয় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কয়েকগুন বেড়ে গেছে, এ অবস্থায় প্রকৃত যোদ্ধারা হয়ে পড়েছেন সংখ্যা লঘিষ্ঠ। যে কারণে রণাঙ্গনে হানাদার-বাহিনী বা রাজাকারদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন; এমন মুক্তিযোদ্ধার তালাশে অনেকটাই বেগ পেতে হয়েছে। এমতবস্থায় সংগৃহীত অনেকের লেখাই বাদ দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট বীরযোদ্ধাগণ সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা না করলে এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ কখনোই সম্ভব হতো না। শত ব্যস্ততার মাঝেও যাঁরা লেখা দিয়ে, সাক্ষাৎকার দিয়ে ও এ বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন; তাঁদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পাটগ্রামের মুক্তিযুদ্ধ গবেষক সায়েদুল ইসলাম পাক্কথনে প্রকাশিত এ বি এম আব্দুল জব্বার প্রধানের লেখা ও ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন; বীরযোদ্ধা পি কে সরকার, বদিউজ্জামান চৌধুরী ও ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র নীরব শান্ত। প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন আইউব আল আমিন এবং গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে অনুপ্রাণীত করেছেন নালন্দা প্রকাশনীর কর্ণধার রেদওয়ানুর রহমার জুয়েল; এঁদের সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
১০ জানুয়ারি ২০২৪॥ ঢাকা ॥
marazzaque85@gmail.com

সূচিপত্র

রণাঙ্গন-৭১-বীরযোদ্ধা আব্দুস সামাদ ১৫ একাত্তরের রণাঙ্গন-বীরযোদ্ধা আবু হোরায়রাহ ২৯ রণাঙ্গনের কথা-বীরযোদ্ধা আ. জব্বার প্রধান ৪৪ একাত্তরের যুদ্ধজীবন-বীরযোদ্ধা কলমদার আলম ৫১ যুদ্ধকালের স্মৃতিকথা-বীরযোদ্ধা গুলজার আহম্মেদ ৫৬ রক্ত ঝরিয়েছি একাত্তরে-বীরযোদ্ধা জসীম উদ্দিন ৬৮ সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতিকথা-বীরযোদ্ধা জহির উদ্দিন ৭৯ প্রতিরোধের প্রহর-মো. জহুর শেখ ৯১ রণাঙ্গনের দিনগুলো-বীরযোদ্ধা দেবেশ সান্যাল ৯৪ সাব সেক্‌টর কমান্ডার-ক্যাপ্‌টেন বাবুল ১০৯ চরঘোনার রণাঙ্গন-বীরযোদ্ধা বজলুল হক বিশ্বাস ১২০ স্বাধীনতার যুদ্ধকাল-বীরযোদ্ধা বাচ্চু মাতুব্বর ১৩৫ যুদ্ধদিনের স্মৃতিকথা-বীরযোদ্ধা মহসীন ভূঁইয়া ১৪৩ দেশের জন্য যুদ্ধ-বীরযোদ্ধা রাধেশ্যাম ১৫৫ আমিও ছিলাম রণাঙ্গনে-বীরযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম ১৬৪ একাত্তরের যোদ্ধাজীবন-বীরযোদ্ধা সমরেন্দ্র সান্যাল ১৬৮ কমান্ডার শহিদ সালাহউদ্দিন-হোসনে আরা বেগম দুলারী ১৭৫

রণাঙ্গন-৭১

বীরযোদ্ধা আব্দুস সামাদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সামাদ লালমনিরহাট শহরের যুগিটারী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৭১ সালে; মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি লালমনিরহাট কলেজের ১ম বর্ষে পড়তেন। সে সময় স্থানীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে চলমান আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। শহরে হানাদার-বাহিনীর অনুপ্রবেশের পর পরিবারসহ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। অতঃপর যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স করেন। এরপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়ে উপ-পরিচালক ও প্রভাষক, শিল্প সম্পর্ক ইন্সটিটিউটে চাকুরি শেষে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধ জীবনের ইতিবৃত্ত তাঁরই ভাষ্যে এখানে তুলে ধরা হলো;

এপ্রিলের চার তারিখে লালমনিরহাট শহরে হানাদার-বাহিনীর অনুপ্রবেশের পর স্থানীয় বিহারিরা তাদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যায় মেতে ওঠে। সে অবস্থায় আমরা আত্মরক্ষার জন্য শহরের পার্শ্ববর্তী পূর্ব দৈলজোর গ্রামে এক বর্গাদারের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। পরবর্তী পর্যায়ে সেখানে থাকাও অনিরাপদ হওয়ায় এপ্রিলের ৮ তারিখে আমরা সীমান্তবর্তী গ্রাম লোহাকুচিতে চলে যাই। সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইদিন অবস্থানের পর শুরু হয় হানাদার-বাহিনীর গোলাবর্ষণ। ওই পরিস্থিতিতে সেখানকার অবস্থান ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ফলে আমাদেরকে এপ্রিলের ১০ তারিখে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের দিনহাটা মহকুমার সীতাই থানার গিদালটারী গ্রামে চলে যেতে হয়। এসময় দেশব্যাপী প্রতিরোধ যুদ্ধও সংঘটিত হতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে ১০ এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে নতুন উদ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সংহত হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চে দেওয়া নির্দেশনার আলোকে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। এ পর্যায়ে প্রবাসী সরকার গঠিত হবার পর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি। সে নিরিখে পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে এপ্রিলের ১৮ তারিখে রওয়ানা দিই দিনহাটার দিকে। পথিমধ্যে পরিচিত দু-জনের দেখা মেলে। এঁদের একজন ছিলেন লুৎফর মামা (লালমনিরহাট পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান) এবং অন্যজন ছিলেন খুটামারার রহমান (রেলওয়ের ড্রাইভার)। দেখা হবার পর লুৎফর মামা বলেন; আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি, তুমিও আমাদের সাথে চল। তাঁদের দেখা পেয়ে খুবই খুশি হই। মামার কথার জবাবে জানাই; আমিও মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। এরপর আমরা একত্রে দিনহাটায় যাই। দুপুর বেলা ভাত খাওয়ার জন্য একটা হোটেলে ঢুকি। খাওয়া-দাওয়ার পর বিল পরিশোধের সময় লুৎফর মামা হোটেলওয়ালাকে জয়বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের কোথায় ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান।

পরক্ষণেই বলেন; এ ব্যাপারে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা কমল গুহ হয়ত কিছু জানেন। আপনারা অপেক্ষা করেন; আমি খোঁজ-খবর নিই। অতঃপর খোঁজ-খবর নিয়ে বললেন; তিনি কাজে আছেন ব্যস্ত আছেন। তোমরা চাইলে তার সঙ্গে দেখা করতে পার। আমি তোমাদের সঙ্গে লোক দিচ্ছি। লোকটি আমাদেরকে কমল গুহ বাবুর কাছে নিয়ে গেল। কমল গুহ আমাদের নানা প্রশ্ন করলেন। জয় বাংলার কোথায় আমাদের বাড়ি? কেন আমরা দিনহাটায় এসেছি? পরিবারের লোকজন কোথায় ইত্যাদি। আমরা বললাম; পাকিস্তান আর্মি আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, হত্যা, লুটতরাজ ও গণহত্যা চালাচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে আমরা ভারতে এসেছি। আমরা ট্রেনিং নিতে চাই। মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাই। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলাতে কমল বাবু বেশ খুশি হন। এরপর তিনি লুৎফর মামার হাতে একটি চিরকুট দিয়ে বললেন; এই চিঠিটি তোমরা কুচবিহারে বাসস্ট্যান্ডে নেমেই ধীরেন বাবুর হাতে দিবে। ওখানকার সবাই ধীরেন বাবুকে চিনে। এরপর তিনি আমাদের একটি বাসে উঠিয়ে দিয়ে বাস ড্রাইভারকে ও কন্ডাকটারকে বললেন; এরা জয়বাংলার লোক তোমরা কোনো ভাড়া নিবে না। আমরা বিকাল ৫টায় কোচবিহার বাসস্ট্যান্ডে নেমে ধীরেন বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায় লোকজন ধীরেন বাবুকে দেখিয়ে দেয়। লুৎফর মামা ধীরেন বাবুকে চিরকুটটি দিলে তিনি আমাদেরকে তাঁর সাথে যেতে বলেন। এরপর তিনি আমাদের একটি পাটের গোডাইনে নিয়ে গিয়ে বলেন; এটাই আপাতত তোমাদের থাকার জায়গা। এখান থেকেই ট্রেনিং এ পাঠানো হবে। সেখানে দেখলাম; গোডাউনে আরও ২০-২৫ জনের মতো ছেলে আগে থেকেই ট্রেনিংয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ওদের সাথে কথা বলে জানলাম; তারা দুপুরে সেখানে এসেছে। তাদের সকলের বাড়ি ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী থানায় (এখন উপজেলা)। ওখানে অবস্থানকালে রাতের বেলা আমাদেরকে কাঁকরযুক্ত মোটা চাল আর পঁচা-দুর্গন্ধ ছোলার ডাল দিয়ে পদ্ম পাতায় খাবার দেওয়া হয়। তা-ই খেয়ে কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দিই। আমাদের ৩ জনের কারও কাছে কোনো লাগেজ ছিল না, বিধায় বিছানা-বালিশ ছাড়া এবড়ো থেবড়ো মাটিতে বিছানো ত্রিপালের উপর ঘুমাতে হয়। সুভাষ পল্লির গুপ্ত পাটের গুদাম ঘরে ১ রাত ১ দিন থাকার পর ভারতীয় আর্মির চারটি ট্রাকে করে আমাদের ২০-৩০ জনকে কুচবিহার শহর হতে ১০-১২